২৪

স্থান -- বেলুড় মঠ
কাল -- (ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

শিষ্য -- স্বামীজী, জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পারে? দেখিতে পাই, ভক্তিপথাবলম্বিগণ আচার্য শঙ্করের নাম শুনিলে কানে হাত দেন, আবার জ্ঞানমার্গীরা ভক্তদের আকুল ক্রন্দন, উল্লাস ও নৃত্যগীতাদি দেখিয়া বলেন, ওরা পাগলবিশেষ।

স্বামীজী -- কি জানিস, গৌণ জ্ঞান ও গৌণ ভক্তি নিয়েই কেবল বিবাদ উপস্থিত হয়। ঠাকুরের সেই ভূত বানরের গল্প শুনেছিস তো?[১]

শিষ্য -- আজ্ঞা হাঁ।

স্বামীজী -- কিন্তু মুখ্যা ভক্তি ও মুখ্যা জ্ঞানে কোন প্রভেদ নেই। মুখ্যা ভক্তি মানে হচ্ছে -- ভগবানকে প্রেমস্বরূপে উপলব্ধি করা। তুই যদি সর্বত্র সকলের ভেতরে ভগবানের প্রেমমূর্তি দেখতে পাস তো কার ওপর আর হিংসাদ্বেষ করবি? সেই প্রেমানুভূতি এতটুকু বাসনা -- ঠাকুর যাকে বলতেন 'কামকাঞ্চনাসক্তি' -- থাকতে হবার জো নেই। সম্পূর্ণ প্রেমানুভূতিতে দেহবুদ্ধি পর্যন্ত থাকে না। আর মুখ্য জ্ঞানের মানে হচ্ছে সর্বত্র একাত্মানুভূতি, আত্মস্বরূপের সর্বত্র দর্শন। তাও এতটুকু অহংবুদ্ধি থাকতে হবার জো নেই।

শিষ্য -- তবে আপনি যাহাকে 'প্রেম' বলেন, তাহাই কি পরমজ্ঞান?

স্বামীজী -- তা বইকি! পূর্ণপ্রজ্ঞ না হলে কারও প্রেমানুভূতি হয় না। দেখছিস তো বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্মকে 'সচ্চিদানন্দ' বলে। ঐ সচ্চিদানন্দ শব্দের মানে হচ্ছে -- 'সৎ' অর্থাৎ অস্তিত্ব, 'চিৎ' অর্থাৎ চৈতন্য বা জ্ঞান, আর 'আনন্দ'ই প্রেম। ভগবানের সৎ-ভাবটি নিয়ে ভক্ত ও জ্ঞানীর মধ্যে কোন বিবাদ-বিসংবাদ নেই। কিন্তু জ্ঞানমার্গী ব্রহ্মের চিৎ বা চৈতন্যসত্তাটির ওপরেই সর্বদা বেশি ঝোঁক দেয়, আর ভক্তগণ আনন্দ-সত্তাটিই সর্বক্ষণ নজরে রাখে। কিন্তু চিৎস্বরূপ অনুভূতি হবামাত্র আনন্দস্বরূপেরও উপলব্ধি হয়। কারণ যা চিৎ, তা-ই যে আনন্দ।

শিষ্য -- তবে ভারতবর্ষে এত সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবল কেন এবং ভক্তি-ও জ্ঞান-শাস্ত্রেই বা এত বিরোধ কেন?

স্বামীজী -- কি জানিস, গৌণভাব নিয়েই অর্থাৎ যে ভাবগুলো ধরে মানুষ ঠিক জ্ঞান বা ঠিক ভক্তি লাভ করতে অগ্রসর হয়, সেইগুলো নিয়েই যত লাঠালাঠি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তোর কি বোধ হয়? End (উদ্দেশ্য) বড়, কি means (উপায়গুলো) বড়? নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য থেকে উপায় কখনও বড় হতে পারে না। কেন না, অধিকারিভেদে একই উদ্দেশ্যলাভ নানাবিধ উপায়ে হয়। এই যে দেখছিস -- জপ ধ্যান পূজা হোম ইত্যাদি ধর্মের অঙ্গ, এগুলি সবই হচ্ছে উপায়। আর পরাভক্তি বা পরব্রহ্মস্বরূপকে দর্শনই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবি -- বিবাদ হচ্ছে কি নিয়ে। একজন বলেছেন -- পূবমুখো হয়ে বসে ভগবানকে ডাকলে তবে তাঁকে পাওয়া যায়; আর একজন বলছেন -- না, পশ্চিমমুখো হয়ে বসতে হবে, তবেই তাঁকে পাওয়া যাবে। হয়তো একজন বহুকাল পূর্বে পূবমুখো হয়ে বসে ধ্যানভজন করে ঈশ্বরলাভ করেছিলেন; তাঁর চেলারা তাই দেখে অমনি ঐ মত

[১] শিব-রামের যুদ্ধ হইয়াছিল। এখন রামের গুরু শিব ও শিবের গুরু রাম, সুতরাং যুদ্ধের পরে দুজনের ভাবও হইল। কিন্তু শিবের চেলা ভূতপ্রেতগুলির আর রামের সঙ্গী বানরগুলির মধ্যে ঝগড়া কিচিমিচি সেই দিন হইতে আরম্ভ হইয়া আজ পর্যন্ত মিটিল না।

চালিয়া দিয়ে বলতে লাগল, পূবমুখো হয়ে না বসলে ঈশ্বরলাভ কখনই হবে না। আর একদল বললে -- সে কি কথা? পশ্চিমমুখো বসে অমুক ভগবান লাভ করেছে, আমরা শুনেছি যে! আমরা তোদের ঐ মাত মানি না। এইরূপে সব দল বেঁধেছে। একজন হয়তো হরিনাম জপ করে পরাভক্তি লাভ করেছিলেন; অমনি শাস্ত্র তৈরি হল -- 'নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।' কেউ আবার 'আল্লা' বলে সিদ্ধ হলেন, তখনি তার আর এক মত চলতে লাগল। আমাদের এখন দেখতে হবে -- এই-সকল জপ-পূজাদির খেই (আরম্ভ) কোথায়। সে খেই হচ্ছে শ্রদ্ধা; সংস্কৃতভাষায় 'শ্রদ্ধা' কথাটি বোঝাবার মতো শব্দ আমাদের ভাষায় নেই। উপনিষদে আছে, ঐ শ্রদ্ধা নচিকেতার হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল। 'একাগ্রতা' কথাটির দ্বারাও শ্রদ্ধা-কথার সমুদয় ভাবটুকু প্রকাশ করা যায় না। বোধ হয় 'একাগ্রনিষ্ঠা' বললে সংস্কৃত শ্রদ্ধা-কথাটার অনেকটা কাছাকাছি মানে হয়। নিষ্ঠার সহিত একাগ্রমনে যে-কোন তত্ত্ব হোক না, ভাবতে থাকলেই দেখতে পাবি, মনের গতি ক্রমেই একত্বের দিকে চলেছে বা সচ্চিদান্দ-স্বরূপের অনুভূতির দিকে যাচ্ছে। ভক্তি- এবং জ্ঞান-শাস্ত্র উভয়েই ঐরূপ এক-একটি নিষ্ঠা জীবনে আনবার জন্য মানুষকে বিশেষভাবে উপদেশ করছে। যুগ-পরম্পরায় বিকৃত ভাব ধারণ করে সেই-সব মহান সত্য ক্রমে দেশাচারে পরিণত হয়েছে। শুধু যে তোদের ভারতবর্ষে ঐরূপ হয়েছে তা নয়, পৃথিবীর সকল জাতিতে ও সকল সমাজেই ঐরূপ হয়েছে। আর বিচার বিহীন সাধারণ জীব ঐগুলো নিয়ে সেই অবধি বিবাদ করে মরছে, খেই হারিয়ে ফেলেছে; তাই এত লাঠালাঠি চলেছে।

শিষ্য -- মহাশয়, তবে এখন উপায় কি?

স্বামীজী -- পূর্বের মতো ঠিক ঠিক শ্রদ্ধা আনতে হবে। আগাছাগুলো উপড়ে ফেলতে হবে। সকল মতে সকল পথেই দেশকালাতীত সত্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুলোর উপর অনেক আবর্জনা পড়ে গেছে। সেগুলো সাফ করে ঠিক ঠিক তত্ত্বগুলি লোকের সামনে ধরতে হবে; তবেই তোদের ধর্মের ও দেশের মঙ্গল হবে।

শিষ্য -- কেমন করিয়া উহা করিতে হইবে?

স্বামীজী -- কেন? প্রথমতঃ মহাপুরুষদের পূজা চালাতে হবে। যাঁরা সেই-সব সনাতন তত্ত্ব প্রতক্ষ্য করে গেছেন, তাঁদের -- লোকের কাছে ideal (আদর্শ বা ইষ্ট) - রূপে খাড়া করতে হবে। যেমন ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মহাদীর ও শ্রীরামকৃষ্ণ। দেশে শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীরের পূজা চালিয়ে দে দিকি। বৃন্দাবন-লীলা-ফীলা এখন রেখে দে। গীতা-সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালা, শক্তিপূজা চালা।

শিষ্য -- কেন, বৃন্দাবন-লীলা মন্দ কি?

স্বামীজী -- এখন শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ পূজায় তোদের দেশে ফল হবে না। বাঁশী বাজিয়ে এখন আর দেশের কলতাণ হবে না। এখন চাই মহাত্যাগ, মহানিষ্ঠা, মহাধৈর্য এবং স্বার্থগন্ধশূন্য শুদ্ধবুদ্ধি সহায়ে মহা উদ্যম প্রকাশ করে সকল বিষয় ঠিক ঠিক জানবার জন্য উঠে পড়ে লাগা।

শিষ্য -- মহাশয়, তবে আপনার মতে বৃন্দাবন-লীলা কি সত্য নহে?

স্বামীজী -- তা কে বলেছে? ঐ লীলার ঠিক ঠিক ধারণা ও উপলব্ধি করতে বড় উচ্চ সাধনার প্রয়োজন। এই ঘোর কামকাঞ্চনাসক্তির সময় ঐ লীলার উচ্চ ভাব কেউ ধারণা করতে পারবে না।

শিষ্য -- মহাশয়, তবে কি আপনি বলিতে চাহেন, যাহারা মধুর-সখ্যাদি ভাব-অবলম্বনে এখন সাধনা করিতেছে, তাহারা কেহই ঠিক পথে যাইতেছে না?

স্বামীজী -- আমার তো বোধ হয় তাই -- বিশেষতঃ আবার যারা মধুরভাবের সাধক বলে পরিচয় দেয়, তারা; তবে দু-একটি ঠিক ঠিক লোক থাকলেও থাকতে পারে। বাকি সব জানবি ঘোর তমোবাবাপন্ন -- full of morbidity (মানসিক দুর্বলতা-সমাচ্ছন্ন)! তাই বলছি, দেশটাকে এখন তুলতে হলে মহাবীরের পূজা চালাতে হবে, শক্তিপূজা চালাতে হবে, শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ঘরে ঘরে করতে হবে। তবে তোদের এবং দেশের কল্যাণ। নতুবা উপায় নেই।

শিষ্য -- কিন্তু মহাশয়, শুনিয়াছি ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) তো সকলকে লইয়া সঙ্কীর্তনে বিশেষ আনন্দ করিতেন।

স্বামীজী -- তাঁর কথা স্বতন্ত্র। তাঁর সঙ্গে জীবের তুলনা হয়? তিনি সব মতে সাধন করে দেখিয়েছেন -- সকলগুলি এক তত্ত্বে পৌঁছে দেয়। তিনি যা করেছেন, তা কি তুই আমি করতে পারব? তিনি যে কে ও কত বড়, তা আমরা কেউই এখনও বুঝতে পারইনি! এইজন্যই আমি তাঁর কথা যেখানে সেখানে বলি না। তিনি যে কি ছিলেন, তা তিনিই জানতেন; তাঁর দেহটাই কেবল মানুষের মতো ছিল, কিন্তু চালচলন সব স্বতন্ত্র অমানুষিক ছিল!

শিষ্য -- আচ্ছা মহাশয়, আপনি তাঁহাকে অবতার বলিয়া মানেন কি?

স্বামীজী -- তোর অবতার-কথার মানেটা কি, তা আগে বল?

শিষ্য -- কেন? যেমন শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, বুদ্ধ, ঈশা ইত্যাদি পুরুষের মতো পুরুষ।

স্বামীজী -- তুই যাঁদের নাম করলি, আমি ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ)-কে তাঁদের সকলের চেয়ে বড় বলে জানি -- মানা তো ছোট কথা। থাক -- এখন সে কথা, এইটুকু এখন শুনে রাখ -- সময় ও সমাজ-উপযোগী এক এক মহাপুরুষ আসেন ধর্ম উদ্ধারকরতে। তাঁদের মহাপুরুষ বল বা আবতার বল, তাতে কিছু আসে যায় না। তাঁরা সংসারে এসে জীবকে নিজ জীবন গঠন করবার ideal (আদর্শ) দেখিয়ে যান। যিনি যখন আসেন, তখন তাঁর ছাঁচে গড়ন চলতে থাকে, মানুষ তৈরি হয় এবং সম্প্রদায় চলতে থাকে। কালে ঐ-সকল সম্প্রদায় বিকৃত হলে আবার ঐরূপ অন্য সংস্কারক আসেন। এই প্রথা প্রবাহরূপে চলে আসছে।

শিষ্য -- মহাশয়, তবে আপনি ঠাকুরকে অবতার বলে ঘোষণা করেন না কেন? আপনার তো শক্তি -- বাগ্মিতা যথেষ্ট আছে।

স্বামীজী -- তার কারণ, আমি তাঁকে অল্পই বুঝেছি। তাঁকে এত বড় মনে হয় যে, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে আমার ভয় হয় -- পাছে সত্যের অপলাপ হয়, পাছে আমার এই অল্পশক্তিতে না কুলোয়, বড় করতে গিয়ে তাঁর ছবি আমার ঢঙে এঁকে তাঁকে পাছে ছোট করে ফেলি!

শিষ্য -- আজকাল অনেকে তো তাঁহাকে অবতার বলিয়া প্রচার করিতেছে!

স্বামীজী -- তা করুক; যে যেমন বুঝেছে, সে তেমন করছে। তোর ঐরূপ বিশ্বাস হয় তো তুইও কর।

শিষ্য -- আমি আপনাকেই সম্যক্ বুঝতে পারি না, তা আবার ঠাকুরকে! মনে হয়, আপনার কৃপাকণা পাইলেই আমি এ জন্মে ধন্য হইব।

অদ্য এইখানেই কথার পরিসমাপ্তি হইল এবং শিষ্য স্বামীজীর পদধূলি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল।